ধর্ম্মের অধিকার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রবাসী কার্য্যালয়,
২১০৷৩৷১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মূল্য দুই আনা।

ধর্ম্মের অধিকার

যেসকল মহাপুরুষের বাণী জগতে আজও অমর হইয়া আছে তাঁহারা কেহই মানুষের মন জোগাইয়া কথা কহিতে চেষ্টা করেন নাই। তাঁহারা জানিতেন মানুষ আপনার মনের চেয়েও অনেক বড়—অর্থাৎ মানুষ আপনাকে যাহা মনে করে সেইখানেই তাহার সমাপ্তি নহে। এই জন্য তাঁহারা একেবারে মানুষের রাজদরবারে আপনার দূত প্রেরণ করিয়াছেন, বাহিরের দেউড়িতে দ্বারীকে মিষ্টবাক্যে ভুলাইয়া কাজ উদ্ধারের সহজ উপায় সন্ধান করিয়া কাজ নষ্ট করেন নাই।

তাঁহারা এমন সব কথা বলিয়াছেন যাহা বলিতে কেহ সাহস করে না, এবং সংসারের কাজকর্ম্মের মধ্যে যাহা শুনিবামাত্র মানুষ বিরক্ত হইয়া ওঠে, বলিয়া বসে এসব কথা কোনো কাজের কথাই নহে। কিন্তু কত বড় বড় কাজের কথা কালের স্রোতে বুদ্বুদের মত ফেনাইয়া উঠিল এবং ভাসিতে ভাসিতে ফাটিয়া বিলীন হইয়া গেল, আর যত অসম্ভবই সম্ভব হইল, অভাবনীয়ই সত্য হইল,

বুদ্ধিমানের মন্ত্রণা নহে কিন্তু পাগলের পাগ্‌লামিই যুগে যুগে মানুষের অন্তরে বাহিরে, তাহার চিন্তায় কর্ম্মে, তাহা দর্শনে সাহিত্যে কত নব নব সৃষ্টিবিকাশ করিয়া চলি তাহার আর অন্ত নাই। তাঁহাদের সেইসকল অদ্ভু কথা ঠেকাইতে গিয়াও কোনোমতেই ঠেকানো যায় না তাহাকে মারিতে চেষ্টা করিলেই আরো অমর হইয়া উঠে তাহাকে পোড়াইলে সে উজ্জ্বল হয়, তাহাকে পুঁতি ফেলিলে সে অঙ্কুরিত হইয়া দেখা দেয়, তাহাকে নব বাধা দিতে গিয়াই আরো নিবিড় করিয়া গ্রহণ করিতে হ —এবং যেন মন্ত্রের বলে কেমন করিয়া দেখিতে দেখি নিজের অগোচরে, এমন কি, নিজের অনিচ্ছায়, সে সকল বাণীর বেদনায় ভাবুক লোকের ভাবের রং বদ হইতে থাকে, কাজের লোকের কাজের সুর ফিরিয়া যায়।

মহাপুরুষেরা মানুষকে অকুণ্ঠিত কণ্ঠে অসাধ্য সাধনের উপদেশ দিয়াছেন। মানুষ যেখানেই একটা কোনে বাধায় আসিয়া ঠেকিয়াছে এবং মনে করিয়াছে ইহা তাহার চরম আশ্রয়; এবং সেইখানেই আপনার শাস্ত্রে প্রথাকে একেবারে নিশ্ছিদ্ররূপে পাকা করিয়া সনাত বাসা বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছে—সেইখানেই মহাপুরুষে আসিয়া গণ্ডি মুছিয়াছেন, বেড়া ভাঙিয়াছেন—বলিয়াছেন পথ এখনও বাকি, পাথেয় এখনো শেষ হয় নাই,

অমৃতভবন তোমার আপন ঘর তোমার চরমলোক সে তোমাদের এই মিস্ত্রির হাতের গড়া পাথরের দেওয়াল দিয়া প্রস্তুত নহে, তাহা পরিবর্ত্তিত হয় কিন্তু ভাঙে না, তাহা আশ্রয় দেয় কিন্তু আবদ্ধ করে না, তাহা নির্ম্মিত হয় না বিকাশিত হয়, সঞ্চিত হয় না সঞ্চারিত হয়, তাহা কৌশলের কারুকার্য্য নহে তাহা অক্ষয় জীবনের অক্লান্ত সৃষ্টি। মানুষ বলে সেই পথযাত্রা আমার অসাধ্য কেননা আমি দুর্ব্বল আমি শ্রান্ত; তাঁহারা বলেন এইখানে স্থির হইয়া থাকাই তোমার অসাধ্য, কেননা তুমি মানুষ, তুমি মহৎ, তুমি অমৃতের পুত্র, ভূমাকে ছাড়া কোথাও তোমার সন্তোষ নাই।

যে ব্যক্তি ছোট সে বিশ্বসংসারকে অসংখ্য বাধার রাজ্য বলিয়াই জানে, বাধামাত্রই তাহার দৃষ্টিকে বিলুপ্ত করে ও তাহার আশাকে প্রতিহত করিয়া দেয় এই জন্য সে সত্যকে জানেনা, বাধাকেই সত্য বলিয়া জানে। যে ব্যক্তি বড় তিনি সমস্ত বাধাকে ছাড়াইয়া একেবারেই সত্যকে দেখিতে পান। এইজন্য ছোটর সঙ্গে বড়র কথার একেবারে এতই বৈপরীত্য। এইজন্য সকলেই যখন একবাক্যে বলিতেছে আমরা কেবল অন্ধকার দেখিতেছি তখনো তিনি জোরের সঙ্গে বলিতে পারেন, বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ—

সমস্ত অন্ধকারকে ছাড়াইয়া আমি তাঁহাকেই জানিতে
যিনি মহান পুরুষ, যিনি জ্যোতির্ম্ময়। এইজন্য য
স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি, অধর্ম্মই আমাকে বাঁচাইতে পা
এই মনে করিয়া হাজার হাজার লোক জালজালিয়া
মারামারি কাড়াকাড়ির দিকে দলে দলে ছুটিয়া চলিয়া
তখনো তাঁহারা অসঙ্কোচে এমন কথা বলেন যে, স্বল্পমপ্
ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ—অতি অল্পমাত্র ধর্ম্মও মহা
হইতে ত্রাণ করিতে পারে; যখন দেখা যাইতেছে সত্য
পদে পদে বাধাগ্রস্ত, তাহা মূঢ়তার জড়ত্বপুঞ্জে প্রতিহত
প্রবলের অত্যাচারে প্রপীড়িত, বাহিরে তাহার দারিদ্র
সর্ব্বপ্রকারেই প্রত্যক্ষ তখনো তাঁহারা অসংশয়ে বলেন,
সর্ষপপরিমাণ বিশ্বাস পর্ব্বতপরিমাণ বাধাকে জয় করিতে
পারে। তাঁহারা কিছুমাত্র হাতে রাখিয়া কথা বলেন না,
মানুষকে খাটো মনে করিয়া সত্যকে তাহার কাছে খাটো
করিয়া ধরেন না—তাঁহারা অসত্যের আস্ফালনকে
একেবারেই অবজ্ঞা করিয়া বলেন, সত্যমেব জয়তে—
এবং সংসারকেই যে সকল লোক অহোরাত্র সত্য বলিয়া
পাক খাইয়া ফিরিতেছে, তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ঘোষণা
করেন—সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম—অনন্তস্বরূপ ব্রহ্মই সত্য।
যাহাকে চোখে দেখিতেছি, স্পর্শ করিতেছি, যাহাকে
জ্ঞানের শেষ বিষয় বলিয়া মনে করিতেছি সত্যকে তাহার

চেয়েও তাঁহায়াই বড় করিয়া দেখাইয়াছেন মানুষের মধ্যে যাঁহারা বড় হইয়া জন্মিয়াছেন।

তাঁহাদের যাহা অনুশাসন তাহাও শুনিতে অত্যন্ত অসম্ভব। সংসারে যে লোকটি যেমন তাহাকে ঠিক তেমনি করিয়া দেখ এ পরামর্শটি নিতান্ত সহজ নহে কিন্তু এখানেই তাঁহারা দাঁড়ি টানেন নাই, তাঁহারা বলিয়াছেন আপনার মত করিয়াই সকলকে দেখ। তাহার কারণ এই আত্মপরের ভেদ যেখানে সেইখানেই তাঁহাদের দৃষ্টি ঠেকিয়া যায় নাই, আত্মপরের মিল যেখানে সেইখানেই তাঁহারা বিহার করিতেছেন। শত্রুকে ক্ষমা করিবে একথা বলিলে যথেষ্ট বলা হইল কিন্তু তাঁহারা সে কথাও ছাড়াইয়া বলিয়াছেন শত্রুকেও প্রীতিদান করিবে যেমন করিয়া চন্দনতরু আঘাতকারীকেও সুগন্ধ দান করে। তাহার কারণ এই প্রেমের মধ্যেই তাঁহারা সত্যকে পূর্ণ করিয়া দেখিয়াছেন, এইজন্য স্বভাবতই সে পর্য্যন্ত না গিয়া তাঁহারা থামিতে পারেন না। তুমি বড় হও, ভাল হও এই কথাই মানুষের পক্ষে কম কথা নয় কিন্তু তাঁহারা একেবারে বলিয়া বসেন—"শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ।" শর যেমন লক্ষ্যের মধ্যে একেবারে নিবিষ্ট হইয়া যায় তেমনি করিয়া তন্ময় হইয়া ব্রহ্মের মধ্যে প্রবেশ কর। ব্রহ্মই পরিপূর্ণ সত্য এবং তাঁহাকেই পূর্ণভাবে পাইতে হইবে

এই কথাটিকে খাটো করিয়া বলা তাঁহাদের কর্ম্ম নহে—তাই তাঁহারা স্পষ্ট করিয়াই বলেন, যে, তাঁহাকে না জানিয়া যে মানুষ কেবল জপ তপ করিয়াই কাটায় অন্তবদেবাস্য তদ্ভবতি, তাহার সে সমস্তই বিনষ্ট হইয়া যায়—তাঁহাকে না জানিয়াই যে ব্যক্তি ইহলোক হইতে অপসৃত হয়, স কৃপণঃ—সে কৃপাপাত্র।

অতএব ইহা দেখা যাইতেছে, মানুষের মধ্যে যাঁহারা সকলের বড় তাঁহারা সেইখানকার কথাই বলিতেছেন যাহা সকলের চরম। কোনো প্রয়োজনের দিকে তাকাইয়া সে সত্যকে তাঁহারা ছোট করেন না। সেই চরম লক্ষ্যকেই অসংশয়ে সুস্পষ্টরূপে সকল সত্যের পরম সত্য বলিয়া স্বীকার না করিলে মানুষকে আত্ম-অবিশ্বাসী ও ভীরু করিয়া রাখা হয়; বাধার ওপারে যে সত্য আছে তাহার কথাই তাহাকে বড় করিয়া না শুনাইয়া বাধাটার উপরেই যদি ঝোঁক দেওয়া হয় তবে সে অবস্থায় মানুষ সেই বাধার সঙ্গেই আপোস করিয়াই বাসা বাঁধে এবং সত্যকে আয়ত্তের অতীত বলিয়া ব্যবহারের বাহিরে নির্ব্বাসিত করিয়া দেয়।

কিন্তু মানবগুরুগণ যে পরম লাভ, যে অসাধ্যসাধনের কথা বলেন তাহাকেই তাঁহারা মানুষের ধর্ম্ম বলিয়া থাকেন। অর্থাৎ তাহাই মানুষের পরিপূর্ণ স্বভাব,

তাহাই মানুষের সত্য। যেমনি লোভ হইবে অমনি কাড়িয়া খাইবে মানুষের মধ্যে এমন একটা প্রবৃত্তি আছে সে কথা অস্বীকার করি না কিন্তু তবু ইহাকে আমরা মানুষের ধর্ম্ম অর্থাৎ মানুষের সত্যকার স্বভাব বলিনা। লোভ হইলেও লোভ দমন করিবে, পরের অন্ন কাড়িয়া খাইবে না, একথা বলিলেও কম বলা হয় না—কিন্তু তবু এখানেও মানুষ থামিতে পারে না। সে বলিয়াছে, ক্ষুধিতকে নিজের অন্ন দান করিবে, ইহাই মানুষের ধর্ম্ম, ইহাই মানুষের পুণ্য, অর্থাৎ তাহার পূর্ণতা। অথচ লোকসংখ্যা গণনা করিয়া যদি ওজনদরে মানুষের ধর্ম্ম বিচার করিতে হয় তবে নিশ্চয়ই বলিতে হইবে নিজের অন্ন পরকে দান করা মানুষের ধর্ম্ম নহে কেননা অনেক লোকই পরের অন্ন কাড়িবার বাধাহীন সুযোগ পাইলে নিজেকে সার্থক মনে করে। তবু আজপর্য্যন্ত মানুষ একথা বলিতে কুণ্ঠিত হয় নাই যে দয়াই ধর্ম্ম, দানই পুণ্য।

কিন্তু মানুষের পক্ষে যাহা সত্য মানুষের পক্ষে তাহাই যে সহজ তাহা নহে। তবেই দেখা যাইতেছে সহজকেই আপনার ধর্ম্ম বলিয়া মানিয়া লইয়া মানুষ আরাম পাইতে চায় না, এবং যে-কোন দুর্ব্বল চিত্ত সহজকেই আপনার ধর্ম্ম বলিয়াছে এবং ধর্ম্মকে আপনার সুবিধামত সহজ করিয়া লইয়াছে তাহার আর দুর্গতির অন্ত থাকে না। আপন ধর্ম্মের

পথকে মানুষ বলিয়াছে "ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।" দুঃখকে মানুষ মনুষ্যত্বের বাহন বলিয়া গণ্য করিয়া লইয়াছে এবং সুখকেই সে সুখ বলে নাই, বলিয়াছে "ভূমৈব সুখং।"

এই জন্যই এই বড় একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখা যায় যে, যাঁহারা মানুষকে অসাধ্যসাধনের উপদেশ দিয়াছেন, যাঁহাদের কথা শুনিলেই হঠাৎ মনে হয় ইহা কোনোমতেই বিশ্বাস করিবার মত নহে, মানুষ তাঁহাদিগকেই শ্রদ্ধা করে অর্থাৎ বিশ্বাস করে। তাহার কারণ মহত্ত্বই মানুষের আত্মার ধর্ম্ম; সে মুখে যাহাই বলুক শেষকালে দেখা যায় সে বড়কেই যথার্থ বিশ্বাস করে। সহজের উপরেই তাহার বস্তুত শ্রদ্ধা নাই; অসাধ্যসাধনকেই সে সত্য সাধনা বলিয়া জানে; সেই পথের পথিককেই সে সর্ব্বোচ্চ সম্মান না দিয়া কোনোমতেই থাকিতে পারে না।

যাঁহারা মানুষকে দুর্গম পথে ডাকেন, মানুষ তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা করে, কেননা মানুষকে তাঁহারা শ্রদ্ধা করেন। তাঁহারা মানুষকে দীনাত্মা বলিয়া অবজ্ঞা করেন না। বাহিরে তাঁহারা মানুষের যত দুর্ব্বলতা যত মূঢ়তাই দেখুন না কেন তবুও তাঁহারা নিশ্চয় জানেন যথার্থত মানুষ হীনশক্তি নহে—তাহার শক্তিহীনতা নিতান্তই একটা বাহিরের জিনিষ; সেটাকে মায়া বলিলেই হয়। এই

তাঁহারা যখন শ্রদ্ধা করিয়া মানুষকে বড় পথে ডাকেন তখন মানুষ আপনার মায়াকে ত্যাগ করিয়া সত্যকে চিনিতে পারে, মানুষ নিজের মাহাত্ম্য দেখিতে পায় এবং নিজের সেই সত্যস্বরূপে বিশ্বাস করিবামাত্র সে অসাধ্যসাধন করিতে পারে। তখন সে বিস্মিত হইয়া দেখে ভয় তাহাকে ভয় দেখাইতেছে না, দুঃখ তাহাকে দুঃখ দিতেছে না, বাধা তাহাকে পরাভূত করিতেছে না, এমন কি, নিষ্ফলতাও তাহাকে নিরস্ত করিতে পারিতেছে না। তখন সে হঠাৎ দেখিতে পায় ত্যাগ তাহার পক্ষে সহজ, ক্লেশ তাহার পক্ষে আনন্দময়, এবং মৃত্যু তাহার পক্ষে অমৃতের সোপান।

বুদ্ধদেব তাঁহার শিষ্যদিগকে উপদেশ দিবার কালে এক সময়ে বলিয়াছিলেন যে, মানুষের মনে কামনা অত্যন্ত বেশি প্রবল, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাহার চেয়েও প্রবল পদার্থ আমাদের আছে; সত্যের পিপাসা যদি আমাদের রিপুর চেয়ে প্রবলতর না হইত তবে আমাদের মধ্যে কেইবা ধর্ম্মের পথে চলিতে পারিত।

মানুষের প্রতি এত বড় শ্রদ্ধার কথা এত বড় আশার কথা সকলে বলিতে পারে না। কামনার আঘাতে মানুষ বারবার স্খলিত হইয়া পড়িতেছে, কেবল ইহাই বড় করিয়া তাহার চোখে পড়ে যে ছোট; কিন্তু তৎসত্ত্বেও সত্যের আকর্ষণে মানুষ যে পাশবতার দিক হইতে মনুষ্যত্বের দিকে

অগ্রসর হইতেছে এইটেই বড় করিয়া দেখিতে পান তিনিই যিনি বড়। এইজন্য তিনিই মানুষকে বারম্বার নির্ভয়ে ক্ষমা করিতে পারেন, তিনিই মানুষের জন্য আশা করিতে পারেন, তিনিই মানুষকে সকলের চেয়ে বড় কথাটি শুনাইতে আসেন, তিনিই মানুষকে সকলের চেয়ে বড় অধিকার দিতে কুণ্ঠিত হন না। তিনি কৃপণের ন্যায় মানুষকে ওজন করিয়া অনুগ্রহ দান করেন না, এবং বলেন না তাহাই তাহার বুদ্ধি ও শক্তির পক্ষে যথেষ্ট,—প্রিয়তম বন্ধুর ন্যায় তিনি আপন চিরজীবনের সর্ব্বোচ্চ সাধনের ধন তাহার নিকট সম্পূর্ণ শ্রদ্ধার সহিত উৎসর্গ করেন, জানেন সে তাহার যোগ্য। সে যে কত বড় যোগ্য তাহা সে নিজে তেমন করিয়া জানে না, তিনি যেমন করিয়া জানেন।

মানুষ বলে, জানি, আমরা পারি না—মহাপুরুষ বলেন, জানি, তোমরা পার ;—মানুষ বলে, যাহা সাধ্য এমন একটা ধর্ম্ম খাড়া কর ; মহাপুরুষ বলেন, যাহা ধর্ম্ম তাহা নিশ্চয়ই তোমাদের সাধ্য। মানুষের সমস্ত শক্তির উপরে তাঁহারা দাবী করেন—কেননা সমস্ত অশক্তির পরিচয়কে অতিক্রম করিয়াও তাঁহারা নিশ্চয় জানেন তাহার শক্তি আছে।

অতএব ধর্ম্মেই মানুষের শ্রেষ্ঠ পরিচয়। ধর্ম্ম মানুষের উপরে যে পরিমাণে দাবি করে সেই অনুসারে মানুষ আপনাকে চেনে। কোনো লোক রাজার ছেলে হইয়াও

হয় ত আপনাকে ভুলিয়া থাকিতে পারে তবুও দেশের লোকের দিক্ হইতে একটা তাগিদ্ থাকা চাই; তাহার পৈতৃক গৌরব তাহাকে স্মরণ করাইতেই হইবে; তাহাকে লজ্জা দিতে হইবে, এমন কি, তাহাকে দণ্ড দেওয়া আবশ্যক হইতে পারে; কিন্তু তাহাকে চাষা বলিয়া মিথ্যা ভুলাইয়া সমস্যাকে দিব্য সহজ করিয়া দিলে চলিবে না; সে চাষার মত প্রত্যহ ব্যবহার করিলেও সত্য তাহার সম্মুখে স্থির রাখিতে হইবে। তেমনি ধর্ম্ম কেবলি মানুষকে বলিতেছে, তুমি অমৃতের পুত্র, ইহাই সত্য; ব্যবহারতঃ মানুষের স্খলন পদে পদে হইতেছে তবু ধর্ম্ম তাহার সত্য পরিচয়কে উচ্চে ধরিয়া রাখিতেছে; মানুষ বলিতে যে কতখানি বুঝায় ধর্ম্ম তাহা কোনোমতেই মানুষকে ভুলিতে দিবে না; ইহাই তাহার সর্ব্বপ্রধান কাজ।

ব্যাধি মানুষের শরীরের স্বভাব নহে, তবু ব্যাধি মানুষকে ধরে। কিন্তু তখন মানুষের শরীরের প্রকৃতি ভিতরের দিক হইতে ব্যাধিকে তাড়াইবার নানাপ্রকার উপায় করিতে থাকে। যতক্ষণ মস্তিষ্ক ঠিক থাকে ততক্ষণ এই সংগ্রামে ভয় বেশি নাই কিন্তু যখন মস্তিষ্ককেই ব্যাধি-শত্রু পরাভূত করে তখনি ব্যাধি সকলের চেয়ে নিদারুণ হইয়া উঠে—কারণ, তখন বাহিরের দিক হইতে চিকিৎ-সকের চেষ্টা যতই প্রবল হউক ভিতরের দিকের শ্রেষ্ঠ

সহায়টি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। মস্তিষ্ক যেমন শরীরে, ধর্ম তেমনি মানবসমাজে। এই ধর্ম্মের আদর্শই নিয়ত ভিতরে ভিতরে মানবপ্রকৃতিকে তাহার সমস্ত বিকৃতির সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়া রাখে কিন্তু যে পরম দুর্দ্দিনে এই ধর্ম্মের আদর্শকেই বিকৃতি আক্রমণ করে সেদিন বাহিরের নিয়ম সংযম আচার অনুষ্ঠান পুলিস ও রাষ্ট্রবিধি যতই প্রবল হউক না কেন, সমাজপ্রকৃতিকে দুর্গতি হইতে বাঁচাইয়া রাখিবে কে? এই জন্য দুর্ব্বলতার দোহাই দিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক ধর্ম্মকে দুর্ব্বল করার মত আত্মঘাতকতা আর কিছুই হইতে পারে না, কারণ, দুর্ব্বলতার দিনেই বাঁচিবার একমাত্র উপায় ধর্ম্মের বল।

আমাদের দেশে সকলের চেয়ে নিদারুণ দুর্ভাগ্য এই যে, মানুষের দুর্ব্বলতার মাপে ধর্ম্মকে সুবিধামত খাটো করিয়া ফেলা যাইতে পারে এই অদ্ভুত বিশ্বাস আমাদিগকে পাইয়া বসিয়াছে। আমরা এ কথা অসঙ্কোচে বলিয়া থাকি, যাহার শক্তি কম তাহার জন্য ধর্ম্মকে ছাঁটিয়া ছোট করিতে দোষ নাই, এমন কি, তাহাই কর্ত্তব্য।

ধর্ম্মের প্রতি যদি শ্রদ্ধা থাকে তবে এমন কথা কি বলা যায়? প্রয়োজন অনুসারে আমরা তাহাকে ছোট বড় করিব। ধর্ম্ম ত জীবনহীন জড় পদার্থ নহে; তাহার উপরে ফরমাসমত অনায়াসে দরজির কাঁচি বা ছুতারের ক...

ত চলে না। এ কথা ত কেহ বলে না যে, শিশুটি ক্ষুদ্র বলিয়া মাকেও চারিদিক হইতে কাটিয়া কম করিয়া ফেল। মা ত শিশুর গায়ের জামার সঙ্গে তুলনীয় নহেন। প্রথমত মাকে কাটিতে গেলেই মারিয়া ফেলা হইবে, দ্বিতীয়ত অখণ্ড সমগ্র মাতাই বড় সন্তানের পক্ষে যেমন আবশ্যক ছোট সন্তানটির পক্ষেও তেমনি আবশ্যক—তাঁহাকে কম করিলে বড়ও যেমন বঞ্চিত হইবে, ছোটোও তেমনি বঞ্চিত হইবে। ধর্ম্ম কি মানুষের মাতার মতই নহে?

আমি জানি আমাকে এই প্রশ্ন করা হইবে সকল মানুষেরই কি বুদ্ধি ও প্রকৃতি একই রকমের? সকলেই কি ধর্ম্মকে একই ভাবে বোঝে? না, সকলে এক নহে; ছোট বড় উঁচু নীচু জগতে আছে। অতএব সত্যকে আমরা সকলেই সমান দূর পর্য্যন্ত পাইয়াছি একথা বলিতে পারি না। আমাদের শক্তি পরিমিত; কিন্তু যতদূর বড় করিয়া সত্যকে পাইয়াছি তাহার চেয়েও সে ছোট এ মিথ্যা কথা ত ক্ষণকালের জন্যও আমরা কাহারও খাতিরে বলিতে পারি না। গ্যালিলিও যে জ্যোতিষ্কতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাহা তখনকার কালের প্রচলিত খৃষ্টানধর্ম্মের সঙ্গে খাপ খায় নাই—তাই বলিয়া একথা বলা কি শোভা পাইত যে, খৃষ্টান বেচারার পক্ষে মিথ্যা জ্যোতির্বিদ্যাই সত্য? তাহাকে কি এই উপদেশ দেওয়া চলিত যে, তুমি খৃষ্টান

অতএব তোমার উচিত তোমার উপযোগী একটা বিশেষ জ্যোতিষকেই একান্ত শ্রদ্ধার সহিত বরণ করা ?

কিন্তু তাই বলিয়া গ্যালিলিওই কি জ্যোতিষের চরমে গিয়াছেন ? তাহা নহে। তবুও তাহা সত্যের দিকে যাওয়া। সেখান হইতেও অগ্রসর হও কিন্তু কোনো কারণেই পিছু হঠা আর চলিবে না ; যদি হঠিতে থাকি তবে সত্যের উল্টা দিকে চলা হইবে সুতরাং তাহার শাস্তি অবশ্যম্ভাবী। তেমনি ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটিমাত্র লোকের বোধও যদি দেশের সকল লোকের বোধকে ছাড়াইয়া গিয়া থাকে তবে তাহাই সমস্ত দেশের লোকের ধর্ম্ম, কারণ, তাহাই দেশের সর্ব্বোচ্চ সত্য। অন্য লোকে তাহা গ্রহণ করিতে রাজি হইবে না, তাহা বুঝিতে বিলম্ব করিবে ; কিন্তু তুমি যদি বুঝিয়া থাক তবে তোমাকে সকল লোকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতে হইবে, ইহাই সত্য এবং ইহা সকল লোকেরই সত্য, কেবল একলা আমার সত্য নহে। কেহ যদি জড়ভাবে বলিতে থাকে ইহা আমি বুঝিতে পারিব না তবে তোমাকে জোর করিয়াই বলিতে হইবে, তুমি বুঝিতে পারিবে, কারণ ইহা সত্য এবং সত্যকে গ্রহণ করাই মানুষের ধর্ম্ম।

ইতিহাসে আমরা কি দেখিলাম ? আমরা দেখিয়াছি, বুদ্ধদেব যখন সত্যকে পাইয়াছি বলিয়া উপলব্ধি করিলেন,

তখন তিনি বুঝিলেন আমার ভিতর দিয়া সমস্ত মানুষ এই সত্য পাইবার অধিকারী হইয়াছে। তখন তিনি ভিন্ন ভিন্ন লোকের শক্তির পরিমাপ করিয়া সত্যের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে মিথ্যার খাদ মিশাইতে লাগিলেন না। তাঁহার মত অদ্ভুত শক্তিমান পুরুষ বহুকাল একাগ্রচিন্তার পর যে সত্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন তাহা যে সকল মানুষেরই নয় একথা তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্যও কল্পনা করেন নাই। অথচ সকল মানুষ তাহাকে শ্রদ্ধা করে নাই, অনেকে তাহা বুদ্ধির দোষে বিকৃতও করিয়াছে। তৎসত্ত্বেও একথা নিশ্চিত সত্য যে, ধর্ম্মকে হিসাব করিয়া ক্ষুদ্র করা কোনোমতেই চলে না—যে তাহাকে যে পরিমাণে মানুক আর না মানুক, সেই যে একমাত্র মাননীয় এই কথা বলিয়া তাহাকে সকলের সামনে পূর্ণভাবে ধরিয়া রাখিতে হইবে। বাপকে সকল ছেলে সমান শ্রদ্ধা করে না এবং অনেক ছেলে তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াও থাকে তাই বলিয়া ছেলেদিগকে শ্রেণীবিভক্ত করিয়া এমন কথা বলা চলে না যে, তোমার বাপ বারো আনা, তোমার বাপ সিকি, এবং তোমার বাপ বাপই নহে তুমি একটা গাছের ডালকে বাপ বলিয়া গ্রহণ কর—এবং এইরূপে অধিকারভেদে তোমরা বাপের সঙ্গে ভিন্নরূপে ব্যবহার করিতে থাক তাহা হইলেই তোমাদের সন্তানধর্ম্ম পালন করা হইবে। বস্তুত পিতার তারতম্য

নাই ;—তাঁহার সম্বন্ধে সন্তানদের হৃদয়ের ও ব্যবহারের যদি তারতম্য থাকে তবে সেই অনুসারে তাহাদিগকে ভাল বলিব বা মন্দ বলিব, একথা কখনই বলিব না তুমি যখন এইটুকু মাত্র পার তখন এইটুকুই তোমার পক্ষে ভাল।

সকলেই জানেন যিশু যখন বাহ্যঅনুষ্ঠানপ্রধান ধর্ম্মকে নিন্দা করিয়া আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের বার্ত্তা ঘোষণা করিলেন তখন য়িহুদিরা তাহা গ্রহণ করে নাই। তবু তিনি নিজের গুটিকয়েক অনুবর্ত্তীমাত্রকেই লইয়া সত্যধর্ম্মকে নিখিল মানবের ধর্ম্ম বলিয়াই প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি একথা বলেন নাই, এ ধর্ম্ম যাহারা বুঝিতে পারিতেছে তাহাদেরই; যাহারা পারিতেছে না তাহাদের নহে। মহম্মদের আবির্ভাবকালে পৌত্তলিক আরবীয়েরা যে তাঁহার একেশ্বরবাদ সহজে গ্রহণ করিয়াছিল তাহা নহে, তাই বলিয়া তিনি তাহাদিগকে ডাকিয়া বলেন নাই, তোমাদের পক্ষে যাহা সহজ তাহাই তোমাদের ধর্ম্ম, তোমরা বাপ দাদা ধরিয়া যাহা মানিয়া আসিয়াছ তাহাই তোমাদের সত্য। তিনি এমন অদ্ভুত অসত্য বলেন নাই, যে, যাহাকে দশজনে মিলিয়া বিশ্বাস করা যায় তাহাই সত্য, যাহাকে দশজনে মিলিয়া পালন করা যায় তাহাই ধর্ম্ম। একথা বলিলে উপস্থিত আপদ মিটিত কিন্তু চিরকালের বিপদ বাড়িয়া চলিত।

একথা বলাই বাহুল্য, উপস্থিতমত মানুষ যাহা পারে সেইখানেই তাহার সীমা নহে। তাহা যদি হইত তবে যুগযুগান্তর ধরিয়া মানুষ মৌমাছির মত একই রকম মৌচাক তৈরি করিয়া চলিত। বস্তুত অবিচলিত সনাতন প্রথার বড়াই যদি কেহ করিতে পারে তবে সে পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ, মানুষ নহে। আরো বেশি বড়াই যদি কেহ করিতে পারে তবে সে ধূলামাটিপাথর। মানুষ কোনো একটা জায়গায় আসিয়া হাল ছাড়িয়া চোখ বুজিয়া সীমাকে মানিতে চায় না বলিয়াই সে মানুষ। মানুষের এই যে কেবলি আরো-র দিকে গতি, ভূমার দিকে টান এইখানেই তাহার শ্রেয়। এই শ্রেয়কে রক্ষা করিবার, ইহাকে কেবলি স্মরণ করাইবার ভার তাহার ধর্ম্মের প্রতি। এইজন্যই মানুষের চিত্ত তাহার কল্যাণকে যত সুদূর পর্য্যন্ত চিন্তা করিতে পারে তত সুদূরেই আপনার ধর্ম্মকে প্রহরীর মত বসাইয়া রাখিয়াছে—সেই মানবচেতনার একেবারে দিগন্তে দাঁড়াইয়া ধর্ম্ম মানুষকে অনন্তের দিকে নিয়ত আহ্বান করিতেছে।

মানুষের শক্তির মধ্যে দুটা দিক্ আছে, একটা দিকের নাম “পারে” এবং আর একটা দিকের নাম “পারিবে”। “পারে”র দিকটাই মানুষের সহজ, আর “পারিবে”র দিকটাতেই তাহার তপস্যা। ধর্ম্ম মানুষের এই “পারিবে”র

সর্ব্বোচ্চ শিখরে দাঁড়াইয়া তাহার সমস্ত "পারে"কে নিয়ত টান দিতেছে—তাহাকে বিশ্রাম করিতে দিতেছে না, তাহাকে কোনো একটা উপস্থিত সামান্য লাভের মধ্যে সন্তুষ্ট থাকিতে দিতেছে না। এইরূপে মানুষের সমস্ত "পারে" যখন সেই "পারিবে"র দ্বারা অধিকৃত হইয়া সম্মুখের দিকে চলিতে থাকে তখনি মানুষ বীর—তখনি সে সত্যভাবে আত্মাকে লাভ করে। কিন্তু "পারিবে"র দিকে এই আকর্ষণ যাহারা সহিতে পারে না, যাহারা নিজেকে মূঢ় ও অক্ষম বলিয়া কল্পনা করে, তাহারা ধর্ম্মকে বলে আমি যেখানে আছি সেইখানে তুমিও নামিয়া এস।—তাহার পরে ধর্ম্মকে একবার সেই সহজ-সাধ্যের সমতলক্ষেত্রে টানিয়া আনিতে পারিলে তখন তাহাকে বড় বড় পাথর চাপা দিয়া অত্যন্ত সনাতনভাবে জীবিতসমাধি দিয়া রাখিতে চায় এবং মনে করে ফাঁকি দিয়া ধর্ম্মকে পাইলাম এবং তাহাকে একেবারে ঘরের দরজার কাছে চিরকালের মত বাঁধিয়া রাখিয়া পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে ভোগ দখল করিতে থাকিলাম। তাহারা ধর্ম্মকে বন্দী করিয়া নিজেরাই অচল হইয়া বসে, ধর্ম্মকে দুর্ব্বল করিয়া নিজেরা হীনবীর্য্য হইয়া পড়ে, এবং ধর্ম্মকে প্রাণহীন করিয়া নিজেরা পলে পলে মরিতে থাকে; তাহাদের সমাজ কেবলি বাহ্য আচারে অনুষ্ঠানে অন্ধ

সংস্কারে এবং কাল্পনিক বিভীষিকার কুজ্ঝটিকায় দশদিকে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে।

বস্তুত ধর্ম্ম যখন মানুষকে অসাধ্যসাধন করিতে বলে তখনি তাহা মানুষের শিরোধার্য্য হইয়া উঠে, আর যখনি সে মানুষের প্রবৃত্তির সঙ্গে কোনোমতে বন্ধুত্ব রাখিবার জন্ম কানে কানে পরামর্শ দেয় যে তুমি যাহা পার তাহাই তোমার শ্রেয়, অথবা দশজনে যাহা করিয়া আসিতেছে তাহাতেই নির্ব্বিচারে যোগ দেওয়াই তোমার পুণ্য, ধর্ম্ম তখন আমাদের প্রবৃত্তির চেয়েও নীচে নামিয়া যায়। প্রবৃত্তির সঙ্গে বোঝাপড়া করিতে এবং লোকাচারের সঙ্গে আপোস করিয়া গলাগলি করিতে আসিলেই ধর্ম্ম আপনার উপরের জায়গাটি আর রাখিতে পারে না; একেবারেই তাহার জাতি নষ্ট হয়।

আমাদের দেশের বর্ত্তমান সমাজে ইহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। আমাদের সমাজে পুণ্যকে সস্তা করিবার জন্ম বলিয়াছে, কোনো বিশেষ তিথিনক্ষত্রে কোনো বিশেষ জলের ধারায় স্নান করিলে কেবল নিজের নহে বহুসহস্র পূর্ব্বপুরুষের সমস্ত পাপ ক্ষালিত হইয়া যায়। পাপ দূর করিবার এতবড় সহজ উপায়ের কথাটা বিশ্বাস করিতে অত্যন্ত লোভ হয় সন্দেহ নাই, সুতরাং মানুষ তাহার ধর্ম্মশাস্ত্রের এই কথায় আপনাকে কিছুপরিমাণে

ভুলায় কিন্তু সম্পূর্ণ ভুলানো তাহার পক্ষেও অসাধ্য। একজন বিধবা রমণী একবার মধ্যরাত্রে চন্দ্রগ্রহণের পরে পীড়িত শরীর লইয়া যখন গঙ্গাস্নানে যাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন আমি তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, "আপনি কি একথা সত্যই বিশ্বাস করিতে পারেন যে পাপ জিনিষটাকে ধূলামাটির মত জল দিয়া ধুইয়া ফেলা সম্ভব? অথচ অকারণে আপনার শরীর-ধর্ম্মের বিরুদ্ধে এই যে পাপ করিতে যাইতেছেন ইহার ফল কি আপনাকে পাইতে হইবে না?" তিনি বলিলেন, "বাবা, এ ত সহজ কথা, তুমি যাহা বলিতেছ তাহা বেশ বুঝি কিন্তু তবু ধর্ম্মে যাহা বলে তাহা পালন না করিতে যে ভরসা পাই না।" একথার অর্থ এই যে, সেই রমণীর স্বাভাবিক বুদ্ধি তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাসের উপরে উঠিয়া আছে।

আর একটা দৃষ্টান্ত দেখ। একাদশীর দিনে বিধবাকে নির্জ্জল উপবাস করিতে হইবে ইহা আমাদের দেশে লোকাচারসম্মত অথবা শাস্ত্রানুগত ধর্ম্মানুশাসন। ইহার মধ্যে যে নিদারুণ নিষ্ঠুরতা আছে স্বভাবত আমাদের প্রকৃতিতে তাহা বর্ত্তমান নাই। একথা কখনই সত্য নহে স্ত্রীলোককে ক্ষুধাপিপাসায় পীড়িত করিতে আমরা সহজেই দুঃখ পাই না। তবে কেন হতভাগিনীদিগকে আমরা ইচ্ছা করিয়া দুঃখ দিই, এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে

আর কোনো যুক্তিসঙ্গত উত্তর খুঁজিয়া পাই না, কেবল এই কথাই বলিতে হয় আমাদের ধর্ম্মে বলে বিধবাদিগকে একাদশীর দিনে ক্ষুধার অন্ন ও পিপাসার জল দিতে পারিবে না, এমন কি, মরিবার মুখে রোগের ঔষধ পর্য্যন্ত সেবন করানো নিষেধ। এখানে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে আমাদের ধর্ম্ম আমাদের সহজবুদ্ধির চেয়ে অনেক নীচে নামিয়া গেছে।

ইহা আমি অনেকবার দেখিয়াছি, ছেলেরা স্বভাবতই তাহাদের সহপাঠী বন্ধুদিগকে জাতিবর্ণ লইয়া ঘৃণা করে না—কখনোই তাহারা আপনাকে হীনবর্ণ বন্ধু অপেক্ষা কোনো অংশে শ্রেষ্ঠ মনে করিতে পারে না, কারণ অনেক স্থলেই শ্রেষ্ঠতা জাতিবর্ণের অপেক্ষা রাখে না তাহা তাহারা প্রত্যহই প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছে, তথাপি আহারকালে তাহারা হীনবর্ণ বন্ধুর লেশমাত্র সংস্পর্শ পরিহার্য্য মনে করে। এমন ঘটনা ঘটিতে দেখা গিয়াছে যে রান্নাঘরের বাহিরের দাওয়ার উপরে একটা ঘুড়ি পড়িয়াছিল সেই ঘুড়িটা তুলিয়া লইবার জন্ত একজন পতিতজাতির ছেলে ক্ষণকালের জন্ত দাওয়ায় পদক্ষেপ করিয়াছিল বলিয়া রান্নাঘরের সমস্ত ভাত ফেলা গিয়াছিল, অথচ সেই দাওয়ায় সর্ব্বদাই কুকুর যাতায়াত করে তাহাতে অন্ন অপবিত্র হয় না। এই আচরণের মধ্যে যে পরিমাণ

অতিঅসহ মানবঘৃণা আছে, তত পরিমাণ ঘৃণা কি যথার্থই আমাদের অন্তরতর প্রকৃতির মধ্যে বর্ত্তমান? এতটা মানবঘৃণা আমাদের জাতির মনে স্বভাবতই আছে একথা আমি ত স্বীকার করিতে পারি না। বস্তুত এখানে স্পষ্টই আমাদের ধর্ম্ম আমাদের হৃদয়ের চেয়ে অনেক নীচে পড়িয়া গিয়াছে।

এইরূপে মানুষ ধর্ম্মকে যখন আপনার চেয়েও নীচে নামাইয়া দেয় তখন সে নিজের সহজ মনুষ্যত্বও যে কতদূর পর্য্যন্ত বিস্মৃত হয় তাহার একটি নিষ্ঠুর দৃষ্টান্ত আমার মনে যেন আগুন দিয়া চিরকালের মত দাগিয়া রহিয়া গিয়াছে। আমি জানি একজন বিদেশী রোগী পথিক পল্লীগ্রামের পথের ধারে তিনদিন ধরিয়া অনাশ্রয়ে পড়িয়া তিল তিল করিয়া মরিয়াছে; ঠিক সেই সময়েই মস্ত একটা পুণ্যস্নানের তিথি পড়িয়াছিল—হাজার হাজার নরনারী কয়দিন ধরিয়া পুণ্যকামনায় সেই পথ দিয়া চলিয়া গিয়াছে; তাহাদের মধ্যে একজনও বলে নাই এই মুমূর্ষুকে ঘরে লইয়া গিয়া বাঁচাইয়া তুলিবার চেষ্টা করি এবং তাহাতেই আমার পুণ্য। সকলেই মনে মনে বলিয়াছে, জানিনা ও কোথাকার লোক, ওর কি জাত—শেষকালে কি ঘরে লইয়া গিয়া প্রায়শ্চিত্তের দায়ে পড়িব। মানুষের স্বাভাবিক দয়া যদি আপনার কাজ করিতে

[য]ায় তবে ধর্ম্মের রক্ষকস্বরূপে সমাজ তাহাকে দণ্ড দিবে। [এ]খানে ধর্ম্ম যে মানুষের হৃদয়প্রকৃতির চেয়েও অনেক [ন]ীচে নামিয়া বসিয়াছে।

আমি পল্লীগ্রামে গিয়া দেখিয়া আসিলাম সেখানে নমশূদ্রদের ক্ষেত্র অন্য জাতিতে চাষ করে না, তাহাদের ধান কাটে না, তাহাদের ঘর তৈরি করিয়া দেয় না— অর্থাৎ পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে মানুষের কাছে মানুষ যে সহযোগিতা দাবি করিতে পারে আমাদের সমাজ ইহাদিগকে তাহারও অযোগ্য বলিয়াছে;—বিনা অপরাধে আমরা ইহাদের জীবনযাত্রাকে দুরূহ- ও দুঃসহ করিয়া তুলিয়া জন্মকাল হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ইহাদিগকে প্রতিদিনই দণ্ড দিতেছি। অথচ মানুষকে এরূপ নিতান্তই অকারণে নির্যাতন করা কি আমাদের স্বভাবসিদ্ধ? আমরা নিজে যাহাদের নিকট হইতে যথেষ্ট পরিমাণে সেবা ও সাহায্য লইতে দ্বিধা করি না তাহাদিগকে সকল প্রকার সহায়তা হইতে বঞ্চিত করাকেই আমাদের ন্যায়বুদ্ধি কি সত্যই সঙ্গত বলিতে পারে? কখনই না। কিন্তু মানুষকে এইরূপ অন্যায় অবজ্ঞা করিতে আমাদের ধর্ম্মই উপদেশ দিতেছে, আমাদের প্রকৃতি নয়। আমাদের হৃদয় দুর্ব্বল বলিয়াই যে আমরা এইরূপ অবিচার করি তাহা নহে,—ইহাই আমাদের কর্ত্তব্য এবং ইহাই না করা

আমাদের স্খলন বলিয়া করিয়া থাকি। আমাদের ধর্ম্ম আমাদের প্রকৃতির নীচে নামিয়া অন্যায়ে আমাদিগকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে—শুভবুদ্ধির নাম লইয়া দেশের নর নারীকে শত শত বৎসর ধরিয়া এমন নির্দ্দয়ভাবে এমন অন্ধ মূঢ়ের মত পীড়ন করিয়া চলিয়াছে!

আমাদের দেশের বর্ত্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এক শ্রেণীর লোক তর্ক করিয়া থাকেন যে, জাতিভেদ ত য়ুরোপেও আছে; সেখানেও ত অভিজাতবংশের লোক সহজে নীচবংশের সঙ্গে একত্রে পানাহার করিতে চান না। ইঁহাদের একথা অস্বীকার করা যায় না। মানুষের মনে অভিমান বলিয়া একটা প্রবৃত্তি আছে, সেইটেকে অবলম্বন করিয়া মানুষের ভেদবুদ্ধি উদ্ধত হইয়া ওঠে ইহা সত্য,—কিন্তু ধর্ম্ম স্বয়ং কি সেই অভিমানটার সঙ্গেই আপোষ করিয়া তাহার সঙ্গে একাসনে আসিয়া বসিবে? ধর্ম্ম কি আপনার সিংহাসনে বসিয়া এই অভিমানের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করিবে না? চোর ত সকল দেশেই চুরি করিয়া থাকে কিন্তু আমাদের সমাজে যে ম্যাজিষ্ট্রেটসুদ্ধ তাহার সঙ্গে যোগ দিয়া চোরকেই আপনার পেয়াদা বলিয়া স্বহস্তে তাহাকে নিজের সোনার চাপরাস পরাইয়া দিতেছে! কোনোকালে বিচার পাইব কোথায়, কোনো মতে রক্ষা পাইব কাহার কাছে?

এরূপ অদ্ভুত তর্ক আমাদের মুখেই শোনা যায় যে, যাহারা তামসিক প্রকৃতির লোক, মদমাংস যাহারা খাইবেই এবং পাশবতা যাহাদের স্বভাবসিদ্ধ, ধর্ম্মের সম্মতিদ্বারা যদি তাহাদের পাশবতাকে নির্দ্দিষ্টপরিমাণে স্বীকার করা যায়—যদি বলা যায় এইরূপ বিশেষভাবে মদমাংস খাওয়া ও চরিত্রকে কলুষিত করা তোমাদের পক্ষে ধর্ম্ম, তবে তাহাতে দোষ নাই, বরং ভালই। এরূপ তর্কের সীমা যে কোন্‌খানে তাহা ভাবিয়াই পাওয়া যায় না। মানুষের মধ্যে এমনতর স্বভাবপাপিষ্ঠ অমানুষ দেখা যায় নরহত্যায় যাহারা আনন্দ বোধ করে। এই শ্রেণীর লোকের জন্য ঠগিধর্ম্মকেই ধর্ম্ম বলিয়া বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া উচিত একথাও বোধ হয় আমাদের মুখে বাধিবে না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঠিক নিজের গলাটা তাহাদের ফাঁসের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত না হয়।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে সত্য সম্বন্ধে মানুষের উচ্চাধিকার নিম্নাধিকার একবার কোথাও স্বীকার করিতে আরম্ভ করিলেই মানুষ যে-মহাতরী লইয়া জীবনসমুদ্রে পাড়ি দিতেছে তাহাকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ভাঙিয়া ছোট ছোট ভেলা তৈরি করা হয়—তাহাতে মহাসমুদ্রে যাত্রা আর চলে না, তীরের কাছে থাকিয়া হাঁটুজলে খেলা করা চলে মাত্র।

কিন্তু যাহারা কেবল খেলিবেই, কোনোদিন যাত্রা করিবেই না, তাহারা খড়কুটা যাহা খুসি লইয়া আপনার খেলনা তৈরি করুক না—তাহাদের জড়তার খাতিরে অমূল্য ধর্ম্মতরীকে টুক্‌রা করিয়াই কি চিরদিনের মত সর্ব্বনাশ ঘটাইতে হইবে?

একথা আবার বলিতেছি, ধর্ম্ম মানুষের পূর্ণ শক্তির অকুণ্ঠিত বাণী, তাহার মধ্যে কোনো দ্বিধা নাই। সে মানুষকে মূঢ় বলিয়া স্বীকার করে না, দুর্ব্বল বলিয়া অবজ্ঞা করে না। সেই ত মানুষকে ডাক দিয়া বলিতেছে, তুমি অজর, তুমি অশোক, তুমি অভয়, তুমি অমৃত। সেই ধর্ম্মের বলেই মানুষ যাহা পারে নাই তাহা পারিতেছে, যাহা হইয়া উঠিবে বলিয়া কোনোদিন স্বপ্নেও মনে করে নাই একদিন তাহাই হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু এই ধর্ম্মের মুখ দিয়াই মানুষ যদি মানুষকে এমন কথা কেবলি বলাইতে থাকে যে, "তুমি মূঢ়, তুমি বুঝিবে না," তবে তাহার মূঢ়তা ঘুচাইবে কে, যদি বলায়, "তুমি অক্ষম, তুমি পারিবে না"—তবে তাহাকে শক্তি দান করে জগতে এমন সাধ্য আর কাহার আছে?

আমাদের দেশে বহুকাল হইতে তাহাই ঘটিয়াছে। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোককেই আমাদের ধর্ম্মশাসন স্বয়ং বলিয়া আসিয়াছে পূর্ণ সত্যে তোমার অধিকার নাই;

অসম্পূর্ণেই তুমি সন্তুষ্ট হইয়া থাক। কতশত লোক পিতা পিতামহ ধরিয়া এই কথা শুনিয়া আসিয়াছে—মন্ত্রে তোমাদের দরকার নাই, পূজায় তোমাদের প্রয়োজন নাই, দেবমন্দিরে তোমাদের প্রবেশ নাই; তোমাদের কাছে ধর্ম্মের দাবি, তোমাদের ক্ষুদ্র সাধ্যের পরিমাণে, যৎকিঞ্চিৎ মাত্র;—তোমরা স্থূলকে লইয়াই থাক চিত্তকে অধিক উচ্চে তুলিতে হইবে না, যেখানে আছ ঐখানেই নীচে পড়িয়া থাকিয়া সহজে তোমরা ধর্ম্মের ফললাভ করিতে পারিবে।

অথচ হীনতম মানুষেরও একটিমাত্র সম্মানের স্থান আছে ধর্ম্মের দিকে—তাহার জানা উচিত সেইখানেই তাহার অধিকারের কোনো সঙ্কোচ নাই। রাজা বল, পণ্ডিত বল, অভিজাত বল, সংসারের ক্ষেত্রেই তাহাদের যত কিছু প্রতাপ প্রভুত্ব—ধর্ম্মের ক্ষেত্রে দীনহীন মূর্খেরও অধিকার কোনো কৃত্রিম শাসনের দ্বারা সঙ্কীর্ণ করিবার ভার কোনো মানুষের উপর নাই। ধর্ম্মই মানুষের সকলের চেয়ে বড় আশা—সেই খানেই তাহার মুক্তি, কেননা সেই খানেই তাহার সমস্ত ভবিষ্যৎ, সেই খানেই তাহার অন্তহীন সম্ভাব্যতা—ক্ষুদ্র বর্ত্তমানের সমস্ত সঙ্কোচ সেই খানেই ঘুচিতে পারে। অতএব সংসারের দিকে, জন্ম বা যোগ্যতার প্রতি চাহিয়া মানুষের স্বত্বকে যতই খণ্ডিত

কর না, ধর্ম্মের দিকে কোনো মানুষের জন্য কোনো বাধা সৃষ্টি করিতে পারে এতবড় স্পর্দ্ধিত অধিকার কোনো পরমজ্ঞানী পুরুষের কোনো চক্রবর্ত্তী সম্রাটের নাই।

ধর্ম্মের অধিকার বিচার করিয়া তাহার সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পার—তুমি কে, যে, তোমার সেই অলৌকিক শক্তি আছে! তুমি কি অন্তর্যামী? মানুষের মুক্তির ভার তুমি গ্রহণ করিবার অহঙ্কার রাখ? তুমি লোকসমাজ, তুমি লৌকিক ব্যবহারেও আপনাকে সামলাইতে পার না, কত তোমার পরাভব, কত তোমার বিকৃতি, কত তোমার প্রলোভন—তুমিই তোমার অত্যাচারের লাঠিটাকে ধর্ম্মের নামে গিল্টি করিয়া ধর্ম্মরাজের স্থান জুড়িয়া বসিতে চাও! তাই করিয়া আজ শত শত বৎসর ধরিয়া এতবড় একটি সমগ্র জাতিকে তুমি মর্ম্মে মর্ম্মে শৃঙ্খলিত করিয়া তাহাকে পরাধীনতার অন্ধকূপের মধ্যে পঙ্গু করিয়া ফেলিয়া দিয়াছ—তাহার আর উদ্ধারের পথ রাখ নাই। যাহা ক্ষুদ্র, যাহা স্থূল, যাহা অসত্য, যাহা অবিশ্বাস্য তাহাকেও দেশকালপাত্রঅনুসারে ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিয়া কি প্রকাণ্ড, কি অসঙ্গত, কি অসংলগ্ন জঞ্জালের ভয়ঙ্কর বোঝা মানুষের মাথার উপরে আজ শত শত বৎসর ধরিয়া চাপাইয়া রাখিয়াছ! সেই ভগ্নমেরুদণ্ড, নিষ্পেষিতপৌরুষ, নতমস্তক মানুষ প্রশ্ন করিতেও জানে না, প্রশ্ন করিলেও তাহার

উত্তর কোথাও নাই—কেবল বিভীষিকার তাড়নায় এবং কাল্পনিক প্রলোভনের ব্যর্থ আশ্বাসে তাহাকে চালনা করিয়া যাইতেছে, চারিদিক হইতেই আকাশে তর্জ্জনী উঠিতেছে এবং এই আদেশ নানা পরুষকণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছে, যাহা বলিতেছি তাহাই মানিয়া যাও কেন না তুমি মূঢ় তুমি বুঝিবে না; যাহা পাঁচজনে করিতেছে তাহাই করিয়া যাও, কেন না তুমি অক্ষম, সহস্র বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তীকালের সহিত তোমাকে আপাদমস্তক শতসহস্র সূত্রে একেবারে বাঁধিয়া রাখিয়াছি কেননা নূতন করিয়া নিজের কল্যাণচিন্তা করিবার শক্তিমাত্র তোমার নাই। নিষেধজর্জ্জরিত চিরকাপুরুষ নির্ম্মাণ করিবার এত বড় সর্ব্বদেশব্যাপী ভয়ঙ্কর লৌহযন্ত্র ইতিহাসে আর কোথাও কি কেহ সৃষ্টি করিয়াছে—এবং সেই মনুষ্যত্ব চূর্ণ করিবার যন্ত্রকে আর কোনো দেশে কি ধর্ম্মের পবিত্র উপাধিতে আখ্যাত করা হইয়াছে!

দুর্গতি ত প্রত্যক্ষ, আর ত কোনো যুক্তির প্রয়োজন দেখি না, কিন্তু সেই প্রত্যক্ষকে চোখ মেলিয়া দেখিব না, চোখ বুজিয়া কি কেবল তর্কই করিব। আমাদের দেশে ব্রহ্মের ধ্যানে, পূজার্চ্চনায় যে বহুবিচিত্র স্থূলতার প্রচার হইয়াছে তর্ককালে তাহাকে আমরা চরম বলিয়া মানি না—আমরা বলিয়া থাকি, যে মানুষ আধ্যাত্মিকতার যে

অবস্থায় আছে এ দেশে তাহার জন্য সেই প্রকার আশ্রয় গড়িয়া দেওয়া হইয়াছে; এইরূপে প্রত্যেকে নিজ নিজ আশ্রয়ে থাকিয়া ক্রমশ স্বতই উচ্চতর অবস্থার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। কিন্তু জানিতে চাই অনন্ত কালের অসংখ্য মানুষের প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার জন্য সেরূপ উপযুক্ত আশ্রয় গড়িতে পারে এমন সাধ্য কাহার। সমস্ত বিচিত্রতাকেই স্থান দিবে, বাধা দিবে না, এতবড় বিশ্বকর্ম্মা মানবসমাজে কে আছে?

বস্তুত মানুষের অসীম বৈচিত্র্যকে যাহারা সত্যই মানে তাহারা মানুষের জন্য অসীম স্থানকেই ছাড়িয়া রাখে। ক্ষেত্র যেখানে মুক্ত বৈচিত্র্য সেখানে আপনিই অবাধে আপনাকে প্রকাশ করিতে পারে। এই জন্যই যে-সমাজে জাগ্রত ও নিদ্রিতকালের সমস্ত ব্যাপারই একেবারে পাকা করিয়া বাঁধা সেখানে মানুষের চরিত্র আপন স্বাতন্ত্র্যে দৃঢ় হইয়া উঠিতে পারে না, সকলেই এক ছাঁচে গড়া নির্জ্জীব ভালোমানুষটি হইয়া থাকে। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও সে কথা খাটে। মানুষের সমস্ত চিন্তাকে কল্পনাকে পর্য্যন্ত যদি অবিচলিত স্থূল আকারে একেবারে বাঁধিয়া ফেলা যায়, যদি তাহাকে বলা যায় অসীমকে তুমি কেবল এই একটি মাত্র বা কয়টিমাত্র বিশেষ রূপেই চিন্তা করিতে থাক তবে সেই উপায়ে সত্যই কি মানুষের

স্বাভাবিক বৈচিত্র্যকে আশ্রয় দেওয়া হয়, তাহার চিরধাবমান পরিণতিপ্রবাহকে সাহায্য করা হয়? ইহাতে তাহার আধ্যাত্মিক বিকাশকে কি বদ্ধ করাই হয় না, আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে তাহাকে কৃত্রিম উপায়ে মূঢ় ও পঙ্গু করিয়াই রাখা হয় না?

এই যে এক সুবিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নানাজাতির নানালোক শিশুকাল হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত নানা অবস্থার মধ্য দিয়া চিন্তা করিতেছে, কল্পনা করিতেছে, কর্ম্ম করিতেছে ইহারা যদি একই জগতের মধ্যে সকলে ছাড়া না পাইত, যদি একদল প্রবলপ্রতাপশালী বুদ্ধিমান ব্যক্তি মন্ত্রণা করিয়া বলিত ইহাদের প্রত্যেকের জন্য এবং প্রত্যেকের প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার জন্য স্বতন্ত্র করিয়া ছোট ছোট জগৎ একেবারে পাকা করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া যাইবে তবে কি সেই হতভাগ্যদের উপকার করা হইত? মানবচিত্তের চিরবিচিত্র অভিব্যক্তিকে কোনো কৃত্রিম সৃষ্টির মধ্যে চিরদিনের মত আটক করা যাইতে পারে এ কথা যিনি কল্পনাও করিতে পারেন তিনি বিশ্বের অমিত্র। ছোট হইতে বড়, অবোধ হইতে সুবোধ পর্য্যন্ত সকলেই এই একই অসীম জগতে বাস করিতেছে বলিয়াই প্রত্যেকেই আপন বুদ্ধি ও প্রকৃতি অনুসারে ইহার মধ্য হইতে আপন শক্তির পরিমাণ পূরা প্রাপ্য আদায় করিয়া

লইবার চেষ্টা করিতেছে। সেই জন্যই শিশু যখন কিশোর বয়সে পৌঁছিতেছে তখন তাহাকে তাহার শৈশবজগৎটা বলপূর্ব্বক ভাঙিয়া ফেলিয়া একটা বিপ্লব ঘটাইতে হইতেছে না। তাহার বুদ্ধি বাড়িল, শক্তি বাড়িল, জ্ঞান বাড়িল তবু তাহাকে নূতন জগতের সন্ধানে ছুটাছুটি করিয়া মরিতে হইল না। নিতান্ত অর্ব্বাচীন মূঢ় এবং বুদ্ধিতে বৃহস্পতি সকলেরই পক্ষে এই একই সুবৃহৎ জগৎ। কিন্তু নিজের উপস্থিত প্রয়োজন বা মূঢ়তাবশতঃ মানুষ যেখানেই মানুষের বৈচিত্র্যকে শ্রেণীবিভক্ত করিয়া প্রত্যেকের অধিকারকে সনাতন করিয়া তুলিতে চাহিয়াছে সেই খানেই হয় মনুষ্যত্বকে বিনাশ করিয়াছে, নয়, ভয়ঙ্কর বিদ্রোহ ও বিপ্লবকে আসন্ন করিয়া তুলিয়াছে। কোনো মতেই কোনো বুদ্ধিমানই মানুষের প্রকৃতিকে সজীব রাখিয়া তাহাকে চিরদিনের মত সনাতন বন্ধনে বাঁধিতে পারেই না। মানুষকে না মারিয়া তাহাকে গোর দেওয়া কিছুতেই সম্ভবপর নহে। মানুষের বুদ্ধিকে যদি থামাইয়া রাখিতে চাও তবে তাহার বুদ্ধিকে বিনষ্ট কর, তাহার জীবনের চাঞ্চল্যকে যদি কোনো একটা সুদূর অতীতের সুগভীর কূপের তলদেশে নিমগ্ন করিয়া রাখিতে চাও তবে তাহাকে নির্জ্জীব করিয়া ফেল। নিজের উপস্থিত প্রয়োজনে অবিবেকী হইয়া উঠিলে মানুষ ত মানুষকে এইরূপ

নির্ম্মমভাবে পঙ্গু করিতেই চায়; সেই জন্যই ত মানুষ নির্লজ্জ ভাষায় এমন কথা বলে যে, আপামর সকলকেই যদি শিক্ষা দেওয়া হয় তবে আমরা আর চাকর পাইব না; স্ত্রীলোককে যদি বিদ্যাদান করা যায় তবে তাহাকে দিয়া আর বাটনা বাটানো চলিবে না; প্রজাদিগকে যদি অবাধে উচ্চ শিক্ষা দেওয়া যায় তবে তাহারা নিজের সঙ্কীর্ণ অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিতে পারিবে না। বস্তুত এ কথা নিশ্চিত সত্য, মানুষকে কৃত্রিমশাসনে বাঁধিয়া খর্ব্ব করিতে না পারিলে কোনো মতেই তাহাকে একই স্থানে চিরকালের মত স্থির রাখিতে পারিবে না। অতএব যদি কেহ মনে করেন ধর্ম্মকেও মানুষের অন্যান্য শত শত নাগপাশবন্ধনের মত অন্যতম বন্ধন করিয়া তাহার দ্বারা মানুষের বুদ্ধিকে, বিশ্বাসকে, আচরণকে চিরদিনের মত একই জায়গায় বাঁধিয়া ফেলিয়া সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকাই শ্রেয়, তবে তাঁহার কর্ত্তব্য হইবে আহারে বিহারে নিদ্রায় জাগরণে শতসহস্র নিষেধের দ্বারা বিভীষিকার দ্বারা প্রলোভনের দ্বারা এবং অসংযত কাল্পনিকতার দ্বারা মানুষকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া রাখা। সে মানুষকে জ্ঞানে কর্ম্মে কোথাও যেন মুক্তির স্বাদ না দেওয়া হয়; ক্ষুদ্র বিষয়েও তাহার রুচি যেন বন্দী থাকে, সামান্য ব্যাপারেও তাহার ইচ্ছা যেন ছাড়া না পায়, কোনো মঙ্গল-

চিন্তায় সে যেন নিজের বুদ্ধিবিচারকে খাটাইতে না পারে এবং বাহ্যিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক কোনো দিকেই সে যেন সমুদ্রপার হইবার কোনো সুযোগ না পায়, প্রাচীনতম শাস্ত্রের নোঙরে সে যেন কঠিনতম আচারের শৃঙ্খলে অবিচলিত হইয়া একই পাথরে বাঁধানো ঘাটে বাঁধা পড়িয়া থাকে! *

কিন্তু তার্কিকের সহিত তর্ক করিতে গিয়া আমি হয় ত নিজের দেশের প্রতি অবিচার করিতেছি। এই যে দেখা যাইতেছে আমাদের ধর্ম্মচিন্তায় স্থূলতা এবং আমাদের

---

* এ কথার উত্তরে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন অধিকারভেদ চিরন্তন নহে, তাহা সাধনার অবস্থাভেদ মাত্র। কিন্তু আমাদের যে সমাজে কোনো বর্ণবিশেষের পক্ষে ধর্ম্মের উচ্চতম অধিকার মুক্ত ও অন্যান্য বর্ণের পক্ষে তাহা রুদ্ধ সেখানে কি এমন কথা বলা চলে? একে ত প্রত্যেক মানুষের অধিকার কোনো কৃত্রিম নিয়মে কেহই স্থির করিয়া দিতেই পারে না, তৎসত্ত্বে যদিবা দেখিতাম সমাজে সেই চেষ্টা সজীব হইয়া আছে, যদি দেখিতাম কখনো বা ব্রাহ্মণ শূদ্র হইয়া যাইতেছে ও শূদ্র ব্রাহ্মণ হইয়া উঠিতেছে তাহা হইলেও অন্তত ইহা বুঝিতে পারিতাম এখানে মানুষের অধিকারলাভ তাহার ব্যক্তিগত ক্ষমতার উপরেই নির্ভর করিতেছে। আমাদের দেশে সমাজের এবং ধর্ম্মের অধিকার-ভেদ হয় ত এককালে সচল ও সজীবভাবে ছিল—কিন্তু যখনি তাহা সচলতা হারাইয়াছে তখনি তাহা আমাদের পথের বাধা হইয়াছে, যখনি তাহা আমাদের জীবনের সঙ্গে বাড়িয়া উঠিতেছে না তখনি তাহা আমাদের জীবনের গতিকে অবরুদ্ধ করিতেছে। এ কথা এখানে স্পষ্ট করিয়া বলা আবশ্যক পুরাকালে আর্য্যসমাজ কি নিয়মে চলিত তাহা এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নহে।

ধর্ম্মকর্ম্মে মূঢ়তা নানা রূপ ধরিয়া আজ সমস্ত দেশকে পর্দ্দার উপর পর্দ্দা ফেলিয়া বহুস্তরের অন্ধতায় আচ্ছন্ন করিয়াছে ইহা কোনো একদল বিশেষ বুদ্ধিমানে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া ঘটায় নাই। যদিও আমরা অহঙ্কার করিয়া বলি ইহা আমাদের বহু দূরদর্শী পূর্ব্বপুরুষদের জ্ঞানকৃত কিন্তু তাহা সত্য হইতেই পারে না—বস্তুত ইহা আমাদের অজ্ঞানকৃত। আমাদের দেশের ইতিহাসের বিশেষ অবস্থায় বিশেষ কারণে বিপাকে পড়িয়া এইরূপ ঘটিয়া উঠিয়াছে। এ কথা কখনই সত্য নহে যে, আমরা অধিকারভেদ চিন্তা করিয়া মানুষের বুদ্ধির ওজনমত ভিন্ন অবস্থার উপযোগী পূজার্চ্চনা ও আচারপদ্ধতি সৃষ্টি করিয়াছি। আমাদের ঘাড়ে আসিয়া যাহা চাপিয়া পড়িয়াছে তাহাই আমরা বহন করিয়া লইয়াছি। ভারতবর্ষে আর্য্যেরা সংখ্যায় অল্প ছিলেন। তাঁহারা আপনার ধর্ম্মকে সভ্যতাকে চিরদিন অবিমিশ্রভাবে নিজেদের প্রকৃতির পথে অভিব্যক্ত করিয়া তুলিতে পারেন নাই। পদে পদেই নানা অনুন্নত জাতির সহিত তাঁহাদের সংঘাত বাধিয়াছিল, তাহাদিগকে প্রতিরোধ করিতে করিতেও তাহাদের সঙ্গে তাঁহাদের মিশ্রণ ঘটিতেছিল পুরাণে ইতিহাসে তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। এমনি করিয়া একদিন ভারতবর্ষীয় আর্য্যজাতির ঐক্যধারা বিভক্ত ও বিমিশ্রিত

হইয়া পড়িয়াছিল। নানা নিকৃষ্ট জাতির নানা পূজাপদ্ধতি আচারসংস্কার কথাকাহিনী তাঁহাদের সমাজের ক্ষেত্রে জোর করিয়াই স্থান গ্রহণ করিয়াছিল। অত্যন্ত বীভৎস নিষ্ঠুর অনার্য্য ও কুৎসিত সামগ্রীকেও ঠেকাইয়া রাখা সম্ভবপর হয় নাই। এই সমস্ত বহুবিচিত্র অসংলগ্ন স্তূপকে লইয়া আর্য্যশিল্পী কোনো একটা কিছু খাড়া করিয়া তুলিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। কিন্তু তাহা অসাধ্য। যাহাদের মধ্যে সত্যকার মিল নাই, কৌশলে তাহাদের মিল করা যায় না। সমাজের মধ্যে যাহা-কিছু স্রোতের বেগে আসিয়া পড়িয়াছে সমাজ যদি তাহাকেই সম্মতি দিতে বাধ্য হয় তবে সমাজের যাহা শ্রেষ্ঠ তাহার আর স্থান থাকে না। কাঁটাগাছকে পালন করিবার ভার যদি কৃষকের উপর চাপাইয়া দেওয়া হয় তবে শস্যকে রক্ষা করা অসাধ্য হয়। কাঁটাগাছের সঙ্গে শস্যের যে স্বাভাবিক বিরোধ আছে তাহার সমন্বয় সাধন করিতে পারে এমন কৃষক কোথায়! তাই আজ আমরা যেখানকার যত আগাছাকেই স্বীকার করিয়াছি; জঙ্গলে সমস্ত ক্ষেত একেবারে নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে;—সেই সমস্ত আগাছার মধ্যে বহু শতাব্দী ধরিয়া ঠেলাঠেলি চাপাচাপি চলিতেছে, আজ যাহা প্রবল, কাল তাহা দুর্ব্বল হইতেছে, আজ যাহা স্থান পাইতেছে কাল তাহা স্থান পাইতেছে না, আবার

এই ভিড়ের মধ্যে কোথা হইতে বাতাসে বাহিরের বীজ উড়িয়া আসিয়া ক্ষেত্রের কোন্ এক কোণে যাতায়াতি আর একটা অদ্ভুত উদ্ভিদকে ভুঁইফুড়িয়া তুলিতেছে। এখানে আর সমস্ত জঞ্জালই অবাধে প্রবেশ করিতে পারে একমাত্র নিষেধ কেবল কৃষকের নিড়ানির বেলাতেই; যাহা কিছু হইতেছে সমস্তই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের নিয়মে হইতেছে;—পিতামহেরা এককালে সত্যের যে বীজ ছড়াইয়াছিলেন তাহার শস্য কোথায় চাপা পড়িয়াছে সে আর দেখা যায় না;—কেহ যদি সেই শস্যের দিকে তাকাইয়া জঙ্গলে হাত দিতে যায় তবে ক্ষেত্রপাল একেবারে লাঠি হাতে হাঁ হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসে, বলে, এই অর্ব্বাচীনটা আমার সনাতন ক্ষেত নষ্ট করিতে আসিয়াছে। এই সমস্ত নানা জাতির বোঝা ও নানা কালের আবর্জ্জনাকে লইয়া নির্ব্বিচারে আমরা কেবলি একটা প্রকাণ্ড মোট বাঁধিতে বাঁধিতেই চলিয়াছি এবং সেই উত্তরোত্তর সঞ্চীয়মান উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট নূতন পুরাতন আর্য্য ও অনার্য্য অসম্বদ্ধতাকে হিন্দুধর্ম্ম নামক এক নামে অভিহিত করিয়া এই সমস্তটাকেই আমাদের চিরকালীন জিনিষ বলিয়া গৌরব করিতেছি;—ইহার ভয়ঙ্কর ভারে আমাদের জাতি কত যুগযুগান্তর ধরিয়া ধূলিলুণ্ঠিত, কোনোমতেই সে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না; এই বিমিশ্রিত বিপুল বোঝাটাই তাহার

জীবনের সর্ব্বোচ্চ সম্পদ বলিয়া তাহাকে গ্রহণ করিতে হইয়াছে; এই বোঝাকে কোনো দিকে কিছুমাত্র হ্রাস করিতে গেলেই সেটাকে সে অধর্ম্ম বলিয়া প্রাণপণে বাধা দিতে থাকে; এবং দুর্গতির মধ্যে ডুবিতে ডুবিতেও আজ সেই জাতির শিক্ষাভিমানী ব্যক্তিরা গর্ব্ব করিতে থাকেন যে, ধর্ম্মের এমন অদ্ভুত বৈচিত্র্য জগতের আর কোথাও নাই, অন্ধসংস্কারের এরূপ বাধাহীন একাধিপত্য আর কোনো সমাজে দেখা যায় না, সকল প্রকার মুগ্ধ বিশ্বাসের এরূপ প্রশস্তক্ষেত্র মানবের ইতিহাসে আর কোথাও প্রস্তুত হয় নাই, এবং পরস্পরের মধ্যে এত ভেদ এত পার্থক্যকে আর কোথাও এমন করিয়া চিরদিন বিভক্ত করিয়া রাখা সম্ভবপর নহে—অতএব বিশ্বসংসারে একমাত্র হিন্দুসমাজেই উচ্চ নীচ সমান নির্ব্বিচারে স্থান পাইয়াছে।

কিন্তু বিচারই মানুষের ধর্ম্ম। উচ্চ ও নীচ, শ্রেয় ও প্রেয়, ধর্ম্ম ও স্বভাবের মধ্যে তাহাকে বাছাই করিয়া লইতেই হইবে। সবই সে রাখিতে পারিবে না—সেরূপ চেষ্টা করিতে গেলে তাহার আত্মরক্ষাই হইবে না। স্থূলতম তামসিকতাই বলে যাহা যেমন আছে তাহা তেমনিই থাক্, যাহা বিনাশের যোগ্য তাহাকেও এই তামসিকতাই সনাতন বলিয়া আঁকড়িয়া থাকিতে চায় এবং যাহা তাহাকে

একই স্থানে পড়িয়া থাকিতে বলে তাহাকেই সে আপনার ধর্ম্ম বলিয়া সম্মান করে।

মানুষ নিয়ত আপনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠকেই প্রকাশ করিবে ইহাই তাহার সাধনার লক্ষ্য—যাহা আপনি আসিয়া জমিয়াছে তাহাকে নহে, যাহা হাজার বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছে তাহাকেও নহে। নিজের এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠকেই নিয়ত প্রকাশ করিবার যে শক্তি, সেই শক্তি তাহার ধর্ম্মই তাহাকে দান করে। এই কারণে মানুষ আপন ধর্ম্মের আদর্শকে আপন তপস্যায় সর্ব্বশেষে, আপন শ্রেষ্ঠতার চরমেই স্থাপন করিয়া থাকে। কিন্তু মানুষ যদি বিপদে পড়িয়া বা মোহে ডুবিয়া ধর্ম্মকেই নামাইয়া বসে তবে নিজের সবচেয়ে সাংঘাতিক বিপদ ঘটায়, তবে ধর্ম্মের মত সর্ব্বনেশে ভার তাহার পক্ষে আর কিছুই হইতে পারে না। যাহাকে উপরে রাখিলে উপরে টানে, তাহাকে নীচে রাখিলে সে নীচেই টানিয়া লয়। অতএব ধর্ম্মকে কোনো জাতি যদি নীতির দিকে না বসাইয়া রীতির দিকে বসায়, বুদ্ধির দিকে না বসাইয়া সংস্কারের দিকেই বসায়, অন্তরের দিকে আসন না দিয়া যদি বাহ্য অনুষ্ঠানে তাহাকে বদ্ধ করে এবং ধর্ম্মের উপরেই দেশকালপাত্রের ভার না দিয়া দেশকালপাত্রের হাতেই ধর্ম্মকে হাত পা বাঁধিয়া নির্ম্মমভাবে সমর্পণ করিয়া বসে; ধর্ম্মেরই দোহাই দিয়া কোনো জাতি যদি মানুষকে পৃথক

করিতে থাকে, এক শ্রেণীর অভিমানকে আর এক শ্রেণীর মাথার উপরে চাপাইয়া দেয় এবং মানুষের চরমতম আশা ও পরমতম অধিকারকে সঙ্কুচিত ও শতখণ্ড করিয়া ফেলে; তবে সে-জাতিকে হীনতার অপমান হইতে রক্ষা করিতে পারে এমন কোনো সভাসমিতি কন্‌গ্রেস কন্‌ফারেন্স, এমন কোনো বাণিজ্যব্যবসায়ের উন্নতি, এমন কোনো রাষ্ট্রনৈতিক ইন্দ্রজাল বিশ্বজগতে নাই। সে জাতি এক সঙ্কট হইতে উদ্ধার পাইলে আর এক সঙ্কটে আসিয়া পড়িবে এবং এক প্রবলপক্ষ তাহাকে অনুগ্রহপূর্ব্বক সম্মানদান করিলে আর এক প্রবলপক্ষ অগ্রসর হইয়া তাহাকে লাঞ্ছনা করিতে কুণ্ঠিত হইবে না; যে আপনার সর্ব্বোচ্চকেই সর্ব্বোচ্চ সম্মান না দেয় সে কখনই উচ্চাসন পাইবে না। ইহাতে কোনো সন্দেহমাত্র নাই যে, ধর্ম্মের বিকারেই গ্রীস মরিয়াছে, ধর্ম্মের বিকারেই রোম বিলুপ্ত হইয়াছে এবং আমাদের দুর্গতির কারণ আমাদের ধর্ম্মের মধ্যে ছাড়া আর কোথাও নাই। এবং ইহাতেও কোনো সন্দেহমাত্র নাই যে, যদি উদ্ধার ইচ্ছা করি তবে কোনো বাহিরের দিকে তাকাইয়া কোনো ফল নাই, কোনো উপস্থিত বাহ্য সুবিধার সুযোগ করিয়া কোনো লাভ নাই;—রক্ষার উপায়কে কেবলি বাহিরে খুঁজিতে যাওয়া দুর্ব্বল আত্মার মূঢ়তা;—ইহাই ধ্রুব সত্য যে ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।

এই যে অনেক কালের বিচিত্র অসংলগ্নতার বিপুল বোঝা বহন করিতে করিতে এত বড় একটি মহৎজাতির বুদ্ধি ও উদ্যম ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে শুধু যদি ইহারই দিকে দৃষ্টিপাত করি তবে নৈরাশ্যে অভিভূত হইয়া পড়িতে হয়। যদি এই কথা চিন্তা করিতে হইত যে এই পর্ব্বতকে বাহির হইতে আঘাত করিতে হইবে তবে চিন্তা অবসন্ন হইয়া পড়িত। কিন্তু আমাদের সকলের চেয়ে একটি বড় আশার কথা আছে সেই কথাটিকেই মনের মধ্যে গ্রহণ করিয়া জয়ের সম্বন্ধে সমস্ত আশঙ্কা দূর করিয়া ঘরে ফিরিব। ইহা নিশ্চয় জানিতে হইবে যত বড় অসত্যের বোঝা আমরা বহন করিতেছি তাহার চেয়েও আরো অনেক বড় সত্যের সাধনা আমাদেরই দেশের মর্ম্মস্থানে বিরাজ করিতেছে ;— যত বড় বিচ্ছিন্নতা ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে তাহার চেয়ে অনেক ব্যাপকতর ঐক্যের বাণী আমাদেরই দেশের চিরন্তন বাণী। আমাদের দেশে ব্রহ্মকে যেমন গভীর করিয়া যেমন অন্তরতম করিয়া দেখিয়াছে এমন আর কোনো দেশেই দেখে নাই, আমাদের দেশে মানুষের চিত্তকে মানুষকেও ছাড়াইয়া যতদূরে প্রসারিত করিতে বলিয়াছে এমন আর কোনো দেশেই বলিতে সাহস করে নাই, আমাদের দেশে প্রেমকে করুণাকে যে সাধ্যের সীমা লঙ্ঘন করিয়া যাইতে আদেশ করিয়াছে অন্য কোনো দেশে তাহা সম্ভবপর হইতে

পারে নাই, আমাদের দেশে এককে যেমন একান্ত করিয়া উপলব্ধি করিয়াছে এবং সেই উপলব্ধিকে যেমন অসঙ্কোচে সর্ব্বত্র প্রয়োগ করিবার দৃষ্টান্ত আমাদের মহাজনে দেখাইয়াছেন তেমন আর কোনো দেশেরই ইতিহাসে প্রকাশ পায় নাই। এক কথায়, ধর্ম্ম আমাদের দেশেই মানুষের শক্তিকে যত বড় করিয়া দেখিয়াছে, ধর্ম্ম আমাদের দেশে মানুষকে যত বড় অসাধ্যসাধন করিতে উপদেশ দিয়াছে এমন আর কোনো দেশেই করে নাই। এই কারণে আমাদের দেশের বর্ত্তমান সমস্যা যতই দুঃসাধ্য হউক্ তাহার একমাত্র মীমাংসার উপায় আমাদেরই দেশের অন্তরের মধ্যেই সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে। আমাদেরই দেশে ধর্ম্মের সেই উচ্চতম আদর্শ রহিয়াছে যাহা সত্যতমরূপে মানুষের সমস্ত বিচ্ছেদ বৈচিত্র্যকে এক করিয়া মিলাইয়া দিতে পারে। সেই ঐক্যতত্ত্ব দেশহিতৈষণা নয়, জাতীয় স্বার্থসাধনা নয়, মানবপ্রেমও নহে—তাহা এক সর্ব্বভূতান্তরাত্মার মধ্যে সকল আত্মার পরম ঐক্য, তাহা বিশ্বচৈতন্যের মধ্যে আত্মচেতনার পরম মিলন, তাহা ব্রহ্মবিহার। অতএব বাহিরের দিক হইতে অসাধ্য যুদ্ধ আমাদের ব্রত নহে—আমাদের মর্ম্মের মধ্যে যেখানে আমাদের দেশের সকলের চেয়ে বড় সত্যটি বিরাজ করিতেছে তাহারই দিকে আমাদের সমস্ত দৃষ্টিকে জাগ্রত করিতে হইবে। আমাদের আলোক আছে কেবল

উদ্বোধন নাই, আমাদের এই যে অন্ধকার ইহা অক্ষির অন্ধকার, রাত্রির অন্ধকার নহে ; আমাদের আছে, কেবল আমরা তাহা পাইতেছি না ; বাহির হইতে আমাদিগকে ভিক্ষা আহরণ করিতে হইবে না, সমস্ত আবরণ ঠেলিয়া অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাদিগকে আবিষ্কার করিতে হইবে। ভয় নাই, আমাদের জড়ত্ব যতই পর্ব্বত-প্রমাণ হউক্ আমাদের সত্যসাধনার স্ফুলিঙ্গমাত্র তাহা অপেক্ষা বলশালী। ভয় নাই, স্থূলত্বের বাধা যতই পুঞ্জ পুঞ্জ হউক না, সত্যের স্পর্শে তাহা যে কেমন করিয়া অন্তর্দ্ধান করে মানবের বিধাতা এই ভারতের ক্ষেত্রেই তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইবেন। আজ যুগারম্ভের প্রভাতে উদ্বোধিত হইয়া সকলে মিলিয়া তাঁহার সেই মহাশ্চর্য্য লীলায় যোগ দিব এবং যুগব্যাপী নিরানন্দকে মহামিলনের পরমানন্দপারাবারে অবসান করিয়া দিব আমাদের প্রতি এই আহ্বান আসিয়াছে।